গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ-১৫ সংখ্যা-২ মার্চ-এপ্রিল ২০১৮ WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

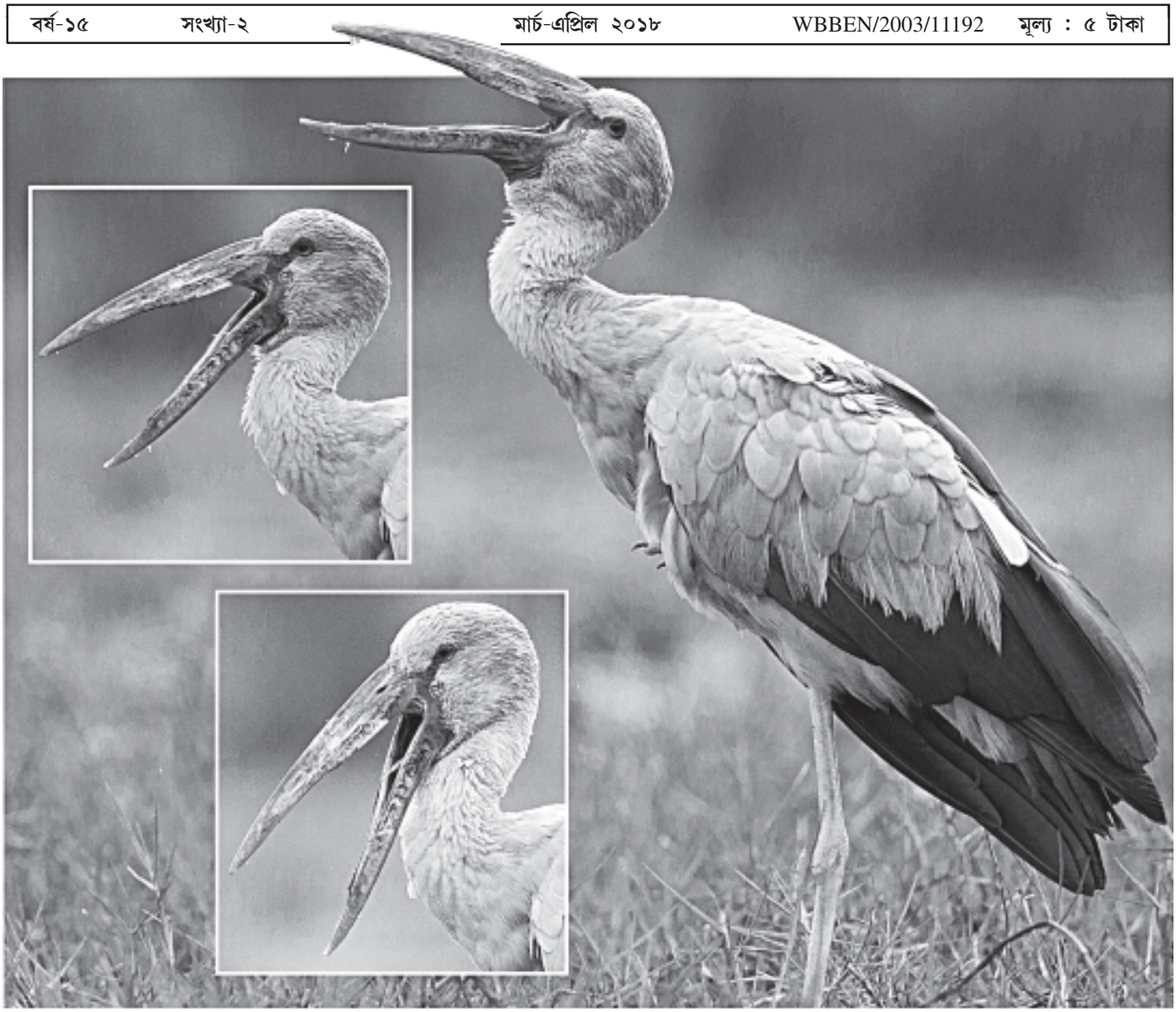

❑ প্রচ্ছদ কথা ২ ❑ জলের রাজপুরী থেকে উদ্ধার ৩ ❑ রহস্যপুরী আন্টার্কটিকা ৪
❑ আমরা সবাই তারার অংশ ৭ ❑ মাদাম কুরী ৮ ❑ সাধারণের স্বাস্থ্য ১০
❑ গ্রহণ ও কুসংস্কার ১২ ❑ জানো কি? ১৩ ❑ সংবাদ ১৪ ❑ কবিতা ১৫
❑ শব্দের খোঁজে / কার্টুন ১৬

আমাদের কথা

ব্যাথা লাগে। যখন দেখি যুক্তি চেতনা বিজ্ঞান চিন্তা—সকল বন্ধক রেখে, দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক প্রধানরা সীমানায় সুরক্ষা যজ্ঞের ব্যবস্থা করছেন। ব্যাথা লাগে। যখন দেখি বিজ্ঞানের সবরকম সুযোগসুবিধার মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও তাদের কেউ কেউ বলে ওঠেন—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিজ্ঞানের আবিস্কারই—'বেদে আছে।' ব্যাথা লাগে। যখন প্রাণদায়ী বৃক্ষগুলিকে কাটতে কাটতে সুমনের গলায় কেউ গেয়ে ওঠেন—"সব তোমাদেরই জন্য'' (!) ব্যাথা লাগে। যখন চটজলদি অর্থের খোঁজে কারা যেন ছোট-বড়-মাঝারি জলাশয় ও তার বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে তার উপরে গড়ে তোলেন 'মানুষের ঠাঁই'। আবার তারাই বলে ওঠেন—"আসুন সকলে মিলে বছরে একটি দিন 'পরিবেশ দিবস' পালন করি। ব্যাথা লাগে। যখন পৃথিবীর এক শতাংশ মানুষ গড়পরতা ষাট শতাংশ সম্পদে বলীয়ান হয়ে পৃথিবীকে আরও উষ্ণ করে তোলেন। তখনও ব্যাথা লাগে। যখন বিজ্ঞানী না হয়েও দুই দেশের প্রধান দম্ভ পরমাণু বোমার 'বোতাম' নিয়ে লোফালুফি করেন। ব্যাথা লাগে। যখন... ব্যাথা...

মনে পড়ে কবির কথা—'সব চিন্তা প্রার্থনার সকল সময়/শূন্য মনে হয়, শূন্য মনে হয়।''

প্রচ্ছদ কথা : শামুক খোলের হাই তোলা

সম্রাট সরকার

সারাদিন কাজকর্মের পর বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাওয়ার আগে একটা লম্বা হাই তোলা আমাদের অভ্যাস। শুধু ঘুমের আগে কেন, কাজকর্মের ফাঁকে আমরা প্রায়শই আড়মোড়া ভেঙে কয়েকটা হাই তুলে ফেলি। আমাদের অবচেতনেই। হাই তোলা মানুষের এক অতি পরিচিত অভ্যাস। শুধু মানুষ কেন, হনুমান, বাঁদর, টিকটিকি, গেকো, কচ্ছপ এমনকি পাখিদের মধ্যেও হাই তোলার প্রবণতা আছে।

মানুষের ক্ষেত্রে হাই তোলা নিয়ে অনেক গবেষণা, লেখালেখি হলেও অন্যান্য প্রাণী বা বিশেষ করে পাখিদের হাই তোলা নিয়ে কাজ বেশি হয়নি। ১৯৬৭ সালে পক্ষীবিজ্ঞানী E G Franz Sauer এবং E M Sauer অর্নিথলজির বিখ্যাত জার্নাল The Auk-এ তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করে দাবি করেন যে পাখি অবশ্যই হাই তোলে। গত বছর ডিসেম্বর মাসে ওড়িশার মংগলাজোড়ি জলাভূমিতে লক্ষ করেছিলাম একটি Openbill Storkকে। আমাদের নৌকার খুব কাছে সে নিশ্চিন্তে ঠোঁট দিয়ে পালক পরিষ্কার করছিল। পক্ষীবিদ্যার ভাষায় এই আচরণটির নাম Preening। আমাদের দেখা শামুকখোলাটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঠোঁট দিয়ে পালক পরিষ্কার করছিল এবং Preening-এর শেষের দিকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর মাথার পেছনটা পিঠের (Neck) ওপর ঘষে নিতে শুরু করে।

পরক্ষণেই তার বিখ্যাত ঠোঁটযুগল ফাঁক করে হাই তুলতে শুরু করল।

পাঠক ভাবতেই পারেন যে আমি কীভাবে সিদ্ধান্তে এসে গেলাম পাখিটা নিশ্চিত ভাবে হাই তুলেছে?

প্রথমত আমি পাখিটার খুব কাছে ছিলাম এবং তার মুখ থেকে কোনো আওয়াজ শুনিনি। তাই পাখিটা নিশ্চিত ভাবে ডাকছিল না।

দ্বিতীয়ত মনে হতে পারে পাখিটা বিপদ আঁচ করে মুখ হাঁ করে কোনো বিপদ সংকেত (Open-mouthed threat gesture) প্রদর্শন করছিল কিনা।

লক্ষ করার বিষয় পাখিটার দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাটি। যদি বিপদ সংকেত দিতেই সে এভাবে হাঁ করত তবে সে একপায়ে বিশ্রামের ভঙ্গিতে দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকত না। দুপায়ে যথেষ্ট সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়াত।

হাই তোলা হল এমন একটি তাপনিয়ন্ত্রক কর্মকাণ্ড (thermoregulatory mechanism) যা মস্তিষ্ক বা/এবং দেহের তাপমাত্রার বৃদ্ধির

কারণে ঘটে। আসলে হাই তোলা হল মস্তিষ্কে ঘটে যাওয়া পরপর অনেকগুলি neurochemical interaction-এর সমষ্টি। অনুমান করা হয় হাই তোলা হল প্রাথমিক ভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে নিজের দেহের তাপমাত্রার ভারসাম্য রাখার কৌশল।

আবার হাই তোলা সরাসরি শারীরিক ক্লান্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। হাই তোলার সময় পাখি গভীর ভাবে শ্বাস নেয় ও ছেড়ে দেয়। ফুসফুস বেশি করে কাজ করে। মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন বাড়ে। শরীরে অক্সিজেনের যোগান বাড়ে। ক্লান্তি দূর হয়।

বেশির ভাগ সময় দেখা যায় পাখির অন্যান্য Comfort Behaviour-এর সাথে সাথে হাই তুলছে। বিশ্রামরত অবস্থায় preening বা stretching-র আগে বা পরে পাখি হাই তুলতে পারে। শামুকখোলটির Preening শেষ হয়েছিল হাই তোলার মধ্যে দিয়ে। যদিও আমার শেষ দেখা অবধি সে একপায়ে বিশ্রামরত অবস্থাতেই ছিল।

E.mail.samratswagata11@gmail.com

M : 9433962227

জলের রাজপুরী থেকে উদ্ধার আদিমতম মানবাস্থি

কৌশিক রায়

নিয়ানডারথাল মানুষ

নিয়ানডারথাল খুলি

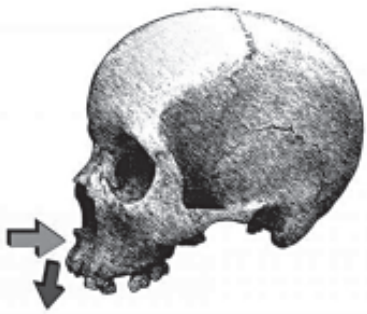

আধুনিক মানুষের খুলি

মানুষের উৎপত্তি ও সমাজগোষ্ঠী সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতে থাকা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী (Anthropologist)-রা এতকাল মনে করতেন আফ্রিকা থেকে উদ্ধার হওয়া ''ড্রায়োপিথেকাস'' এবং ''অস্ট্রালোপিথেকাস''-এর মতো নরবানর বা প্রাইমেট-রাই আমাদের সবচেয়ে পুরোনো পূর্বপুরুষ। তবে, সেই ধারণাটাকে সম্প্রতি পাল্টাতে বলছেন বিজ্ঞানীরা।

আজকের বিশ্ব মানচিত্রে, হল্যান্ড এবং ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের মধ্যে যেখানে উত্তর সাগর, বা নর্থ সী-র সুনীল, তরঙ্গায়িত জলরাশি বয়ে চলেছে, আজ থেকে ৪০ হাজার বছর আগে সেখানে ছিলো এক ঘন, বন্যপ্রাণী সঙ্কুল অরণ্য। বল্গা হরিণ, আদিম ঘোড়া বা প্লিওহিপ্পাস, লোমশ গণ্ডার, হাতির লোমশ পূর্বপুরুষ—ম্যামথদের সাথে সেখানে বাস করতো নিয়ানডারথাল মানুষ। এই মানুষের খুলির সামনের দিকের ফসিল হওয়া হাড়ের টুকরোকে নর্থ সী-র তলদেশ, বা জিল্যান্ড উপকূলের নিকটবর্তী এলাকা থেকে খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে—সমুদ্রের তলাতে এর থেকে পুরোনো কোনও মানব অস্থিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই হাড়গুলোর সাথেই পাওয়া গেছে নিয়ানডারথাল মানবের ব্যবহৃত ছোট হাত-কুড়ুল, শিকারের মাংস ছাড়ানোর জন্য ধারালো পাথরের ফলা। যে পদ্ধতিতে এভাবে নিয়ানডারথাল মানবরা, মধ্য প্রস্তর যুগে (মেসোলিথিক) অথবা ২ লক্ষ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৪০ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি বানাতো, তাকে বলা হয় ''লেভাল্যোয়া'' (Levallois) পদ্ধতি। এই হাতিয়ারগুলির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেছেন জার্মানির লাইপজিগ শহরে অবস্থিত ম্যাংক্স প্ল্যাংক বিবর্তন নৃতত্ত্ব শিক্ষায়তনের বিজ্ঞানী—জঁ জাক্ হুব্লিন।

M : 9547659679

রহস্যপুরী আন্টার্কটিকা

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

গরম জামাকাপড় সঙ্গে আছে তো? আমরা যেখানে যাব সেটা পৃথিবীর সবচেয়ে ঠান্ডা জায়গা। হাঁড়-কাপানো শীতের সঙ্গে আছে তুষার ঝড়। চারদিকে শুধু বরফ, বরফ আর বরফ। জায়গাটা কোথায়, নিশ্চয়ই তোমাদের জানতে ইচ্ছে করছে। তাহলে মন দিয়ে শোন। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে গেলে কোন মহাসাগর দেখতে পাবে? ঠিক বলেছ, ভারত মহাসাগর। এবারে জাহাজে চেপে যদি ক্রমশ দক্ষিণ দিকে যাওয়া যায় তাহলে আমরা পৌঁছে যাব সেই দেশে। তবে আমরা ভারত থেকে নয়, আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে জাহাজে উঠব। এতে সমুদ্র যাত্রার ধকল অনেকটা কমে যাবে। তাহলে, চল আমরা যাত্রা শুরু করি।

যেতে যেতে জায়গাটা ও সেখানকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে তোমাদের কিছু ধারণা দিয়ে রাখি। তাহলে সেখানে পৌঁছে দেখার আনন্দটা অনেক বেড়ে যাবে। আমাদের জাহাজ যেখানে গিয়ে থামবে সেখানে আটলান্টিক, প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগর এক জায়গায় এসে মিশেছে। এই তিনটে মহাসাগর যে মহাদেশকে ঘিরে রেখেছে তার নাম আন্টার্কটিকা, আর ওই এলাকার নাম কুমেরু অঞ্চল। সেখানকার সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় বিশাল পুরু বরফের চাঁই। শীতকালে তো সমুদ্রের উপরটা জমেই থাকে। আর মহাদেশটা? পুরোপুরি বরফে ঢাকা। গাছপালা তো দূরের কথা, সামান্য ঘাসও সেখানে নেই। সবুজের কোনো চিহ্নই নেই। ওই মহাদেশের আবহাওয়া এতটাই ঠান্ডা যে সহ্য করা কষ্টকর। শুনলে তোমরা অবাক হবে যে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাতের ওই হিমের দেশে অনেক জীবজন্তু বাস করে।

যে দেশে কোনো গাছপালা নেই সে দেশে পাখি থাকার কথা নয়। অথচ অবাক করা খবর হল এই যে, এখানে নানা ধরনের পাখি আছে। যেমন, স্কুয়া, ফালমার, পেট্রেল, আর্কটিকান, আলবাট্রস ইত্যাদি। আর ডাঙার প্রধান অধিবাসী পেঙ্গুইন তো আছেই। তোমরা আকাশে বাজপাখি উড়তে দেখেছ। স্কুয়া হল আন্টার্কটিকার বাজপাখি। আকাশে উড়তে উড়তে এরা কখন যে পেঙ্গুইনের বাচ্চা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে বোঝাই যাবে না। আন্টার্কটিকার নীল আকাশে যখন ধবধবে সাদা স্নো পেট্রেল উড়ে বেড়ায় তখন দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। এদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে সাদায়-কালোয় মেশানো উইলসনস্ স্টর্ম পেট্রেল। রবার্ট ফ্যালকন স্কট ১৯০৩ সালের ২ নভেম্বর বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে আন্টার্কটিকায় গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন উইলসন ও শ্যাকলটন। বিজ্ঞানী উইলসনের নামে এই পাখিটির নাম রাখা হয়। পায়রার মতো দেখতে পেট্রেলগুলি স্কুয়াদের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। একটু অসাবধান হলেই ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে পেট চিরে দু-ফাঁক করে দেবে। আন্টার্কটিকা ঘিরে যে দ্বীপগুলি আছে সেখানে করমোরান্ট, ফুলমার ইত্যাদি পাখিগুলিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। মাছের লোভে আলবাট্রস পাখিগুলি সমুদ্রের কাছাকাছি ভিড় জমায়। তিমি পাখি নামে এক ধরনের অদ্ভুত পাখি এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এদের চোয়ালে তিমির মতো বাঁকা হাড় ও হাড়ের মধ্যে চামড়ার জালি থাকে।

স্কুয়া

উইলসনস্ স্টর্ম পেট্রেল

তিমি পাখী

আন্টার্কটিকার প্রধান আকর্ষণ পেঙ্গুইন। এই পাখি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সাদা-কালো পালকে ঢাকা পাখিগুলি যখন দলবেঁধে একসঙ্গে দুলে-দুলে দু-পায়ে হেঁটে বেড়ায় তখন মনে হয় যেন ডাঙায় সমুদ্রের ঢেউ খেলছে। এদের বুকের দিকটা সাদা আর পিঠ ও ডানা দুটি কালো। এরা উড়তে পারে না। তবে জলে সাঁতার কাটতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে এরা সরীসৃপ থেকে পাখি হওয়ার প্রথম ধাপের পাখি। তাই এদের আদিম পাখি বলা হয়। আন্টার্কটিকাতে কয়েক

এম্পেরর পেঙ্গুইন

ধরনের পেঙ্গুইন আছে। যেমন, এম্পেরর পেঙ্গুইন, অ্যাডেলি পেঙ্গুইন, কিং পেঙ্গুইন, ম্যাকারনি, জেন্টো আর চিনস্ট্র্যাপ পেঙ্গুইন। এদের মধ্যে এম্পেরর ও অ্যাডলি পেঙ্গুইন সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। অ্যাডেলি পেঙ্গুইনদের আন্টার্কটিকার সঙ বলা হয়। এরা ভীষণ কৌতূহলী। মাঝে মাঝে এদের মধ্যে কেউ-কেউ আন্টার্কটিকায় বিভিন্ন দেশের যে গবেষণাগারগুলি আছে তার কাছাকাছি চলে আসে। বেশ কিছুদিন সেখানে থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে বোঝার চেষ্টা করে ব্যাপারটা কী হচ্ছে সেখানে। এরা খুব ভালো সাঁতার কাটতে পারে। পেঙ্গুইনদের মধ্যে এম্পেরর পেঙ্গুইন আকারে সবচেয়ে বড়। এরা লম্বায় চার ফুটের মতো আর ওজনে চল্লিশ কিলোর কাছাকাছি হয়। তুলনায় অ্যাডেলি পেঙ্গুইন দু-ফুটের কাছাকাছি হয়ে থাকে।

পেঙ্গুইনরা খুব মিশুকে। এরা দল বেঁধে থাকতে ভালোবাসে। মানুষের প্রতি এদের কোনো ভয়ডর নেই। বরং মানুষ দেখলেই কোল ঘেষে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে এমন ভাব-ভঙ্গি করবে যেন কতদিনের পরিচিত। তবে এরা একেবারেই ঝগড়া করে না এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। যখন ঝগড়া করে তখন মনে হবে এদের মতো ঝগড়ুটে পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই।

ক্রিল

এই মহাদেশের ডাঙাতে যত না জীবজন্তু আছে তাদের চেয়ে অনেক বেশি জীবজন্তু আছে এখানকার সমুদ্রে। কুচো চিংড়ির মতো দেখতে ক্রিলে ভর্তি এই সমুদ্র। এদের কেবল এই দক্ষিণ সমুদ্রেই পাওয়া যায়। এছাড়াও এখানে আছে কড মাছের মতো এক ধরনের মাছ। পেঙ্গুইনদের প্রধান খাদ্য এই ক্রিল। খাবারের সময় হলেই এরা জলের ধারে এসে জমায়েত হয়। পেঙ্গুইনের দল যত বড় হয় 'লেপার্ড

লেপার্ড সিল

সিল' আর 'অরকা'-র প্রাণ তত নেচে ওঠে। কারণ এরাই হল পেঙ্গুইনদের প্রধান শত্রু। আন্টার্কটিকায় প্রচুর তিমি ও সিল আছে। তিমির মধ্যে আছে নীল তিমি, ফিন তিমি, মিংক তিমি, হাম্পব্যাক তিমি, শিকারি তিমি ইত্যাদি। এদের মধ্যে শিকারি তিমিরা অত্যন্ত

নীল তিমি

শিকারী তিমি

ফিন তিমি

মিংক তিমি

হিংস্র। এরা 'অরকা' নামেও পরিচিত। এরা দল বেঁধে বরফের তলায় লুকিয়ে থাকে। পেঙ্গুইনের দল জলে নামলেই খপাখপ ধরে গপাগপ পেটে চালান করে দেয়। তাই জলের ধারে এসে কে আগে জলে নামবে তা নিয়ে পেঙ্গুইনদের মধ্যে শুরু হয় ঠেলাঠেলি। এ বলে আগে তুই নাম, ও বলে তুই নাম। জলে আর কেউ নামে না। কে চায় সাধ করে তিমির পেটে যেতে? কিন্তু জলে না নামলে তো চলবে না। খাবার যে ওখানেই আছে। অতএব সমস্যা সমাধানের জন্য জলের ধারে বরফের উপরেই বসে পেঙ্গুইন-সভা। সেখানেই ঠিক হয় কে আগে জলে ঝাঁপ দেবে। সাধারণত যে দুর্বল তাকেই বলির পাঁঠা করা

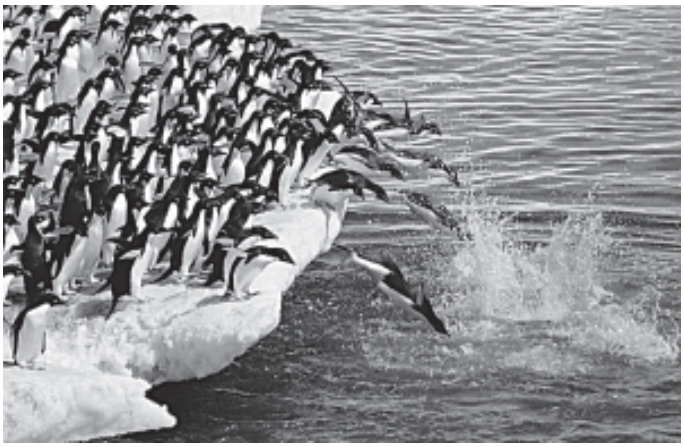

হয়। এবার সবাই মিলে তাকে ঠেলে জলের ধারে নিয়ে যায়। কোনো ওজর-আপত্তি শোনে না। সকলে ঘিরে রাখে যাতে পালাতে না পারে। নিজে থেকে ঝাঁপ দিলে ভালো, নয়তো সবাই মিলে এক ধাক্কায় ঠেলে ফেলে দেবে জলে। ঝুপ করে জলে পড়ার পর বাকিরা মুখ বাড়িয়ে দেখবে বেচারা বেঁচে আছে কিনা। যদি থাকে, তবে দাঁড়াও বন্ধু আমরাও আসছি। আর যদি না থাকে তবে টা-টা, তুমি থাকো তিমির পেটে আমরা কেটে পড়ি।

পেঙ্গুইনের দল তো পালিয়ে গেল। অরকারা কী করবে? ক্রিল খেয়ে দিন কাটাবে? রোজ রোজ কি আর ক্রিল খেতে ভালো লাগে? একটু আধটু মাংস না হলে চলে? তাহলে, উপোস? মোটেই না। ওরাও কম চালাক নয়। বরফের খাঁজ থেকে বেরিয়ে এসে উঁকি মেরে দেখবে পালিয়ে গিয়ে পেঙ্গুইনের দল কোন বরফের চাঁই-এর উপর গিয়ে বসে আছে। কাছাকাছি থাকলে নানারকম শব্দের সিগন্যাল ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে নেয়। তারপর ঝাঁক বেঁধে গুটি-গুটি ওই বরফের চাঁই-এর নীচে চলে আসে। এরপর একসঙ্গে ছুটে এসে বরফের নিচে টর্পেডোর মতো মারে ধাক্কা। বরফের চাঁই ভেঙে চৌচির। পেঙ্গুইনের দল জলে পড়ে যেই হাবুডুবু খেতে শুরু করে তখনই অরকার দল ঝাপিয়ে পড়ে ওদের উপর। তারপরেই শুরু হয়ে যায় মহাভোজ।

এবারে আসি সিলের কথায়। সিলদের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ হল ওয়েডেল সিল। এরা লম্বায় তিন মিটারের মতো। ওজন চারশো

ওয়েডেল সিল

কিলোর কাছাকাছি। রস, ফার, হাতি সিলরা হিংস্র নয়। এরা মাছ আর ক্রিল খেয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তবে দক্ষিণ সমুদ্রের বিভীষিকা লেপার্ড বা চিতা সিল যেমন হিংস্র তেমন ক্ষিপ্র। এরা একা একাই সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। পেঙ্গুইন বা অন্যান্য সিলদের বাচ্চা দেখলে এরা আর লোভ সামলাতে পারে না— খাই খাই করে মন কখন যে খাবো রে। ওত পেতে বসে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। পেঙ্গুইন শিকারে এদের বেশ মেহনত করতে হয়। কারণ পেঙ্গুইনরা সাঁতারে খুবই দক্ষ। এদের সঙ্গে সাঁতারে চিতা সিল পেরে ওঠে না। কিন্তু বুদ্ধিতে চিতা সিল পেঙ্গুইনদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে। তাই এরা বুদ্ধি করে একশো মিটারের বদলে আটশো মিটার সাঁতার প্রতিযোগিতায় পেঙ্গুইনদের নামিয়ে দেয়। তাড়া খাওয়া পেঙ্গুইনটি দ্রুতগতিতে সাঁতার কেটে পালাতে চেষ্টা করে। চিতা সিল পেঙ্গুইনটির পালানোর পথ এমনভাবে আগলে রাখে যে বেচারা পালানোর পথ পায় না। তখন সে সমুদ্রের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। সিলটিও ওর পিছন পিছন ঘুরতে থাকে আর মনে মনে ভাবে কতক্ষণ ঘুরবে ঘোর, একসময় না একসময় বেদম তো হবেই আর তখনই কপাৎ-কোঁৎ। চিতা সিল কাউকেই ভয় পায় না। একমাত্র রাক্ষুসে তিমি অরকার কাছেই এরা কাবু।

রস সিলরা একটু লাজুক প্রকৃতির। মানুষের কাছাকাছি এরা একেবারেই আসতে চায় না। তবে গান শোনাতে এদের আপত্তি নেই। আন্টার্কটিকায় যাঁরা গেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এদের গান শুনেছেন। কিন্তু দেখা পাননি। অনেকে এদের গায়ক সিলও বলে

থাকেন। আসলে এরা যখন একে অন্যকে ডাকে তখন গানের মতো শোনায়। আর সংখ্যায় খুব কম হওয়ায় এদের দেখা পাওয়া কষ্টকর।

বরফের নিচে জল। আর সেই জলের নিচে থাকে এক ধরনের অদ্ভুত প্রাণী—ইঞ্চি ছয়েক লম্বা, গোলাপি রঙ, মাথার সামনের দিকে একটি হাড়ের প্লেট। এই প্লেটের মধ্যে থাকে হাজার হাজার সরু সরু শিরা। এই শিরাগুলির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে তাপ। যে তাপ বের হয় তার পরিমাণ খুব একটা কম নয়, প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো। এরা দল বেঁধে থাকে। যখন পেঙ্গুইনরা কোনো বরফের চাঁই-এর উপর বসে থাকে তখন এরা সেই বরফের চাঁই-এর নিচে গিয়ে একসঙ্গে প্লেটগুলি ঠেকিয়ে দেয় বরফের গায়ে। তাপ পেয়ে বরফ গলতে শুরু করে। একসময় একটা বড় ফুটো তৈরি হয়। সেখানে যে পেঙ্গুইনটা বসে থাকে সে ঝুপ করে জলে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীগুলি পেঙ্গুইনটাকে ছেঁকে ধরে। অন্য পেঙ্গুইনগুলি ততক্ষণে দে-চম্পট।

তোমরা শুনলে অবাক হবে আন্টার্কটিকার মতো হিমশীতল জায়গাতেও জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। আগ্নেয়গিরিটার নাম অ্যাবিক্স।

দক্ষিণ মেরু যেন সত্যিই এক রহস্যপুরী। মানুষ বারবার ছুটে গেছে সেই রহস্যকে জানতে। কিন্তু আজও সেই রহস্য পুরোপুরি জানা হয়ে ওঠেনি। তোমরা দেখ সেখানে পৌঁছে নতুন কিছুর খোঁজ পাও কিনা।

চিহ্নিত অ্যাবিক্স আগ্নেয়গিরি

E.mail.kbb.scwriter@gmail.com • M : 9433145112

আমরা সবাই তারার অংশ

অমিতাভ চক্রবর্তী

[আগের সংখ্যায় যা ছিল : ব্রহ্মান্ডের সূচনা— নক্ষত্রে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের উপস্থিতি— B^2FH—নতুন ছয়টি মৌল তৈরি—চব্বিশটি মৌলের সৃষ্টি রহস্য— সর্বশেষ মৌল আয়রন।]

এবার ব্রহ্মান্ডের আরেক বিস্ময় 'সুপারনোভা বিস্ফোরণ' (supernova explosion) একটু বুঝে নেওয়া দরকার। এই মহাজাগতিক বিস্ফোরণ-এর নেপথ্যে অনেক কারণ থাকলেও আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রধানতঃ দু'ধরনের ঘটনা প্রবাহের কথা বলে থাকেন। প্রথমতঃ যখন কোনো 'শ্বেতবামন' (white dwarf) নক্ষত্র নিকটবর্তী অন্য কোনো 'লালদৈত্য'[১] (red giant) নক্ষত্রের কাছ থেকে ভর সংগ্রহ করে 'চন্দ্রশেখর সীমা'[২] অতিক্রম করে ফেলে। ভর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে অভ্যন্তরের তাপমাত্রা এবং এক মহাজাগতিক বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় সেই নক্ষত্রের। ভর ও শক্তি ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারদিকে। আর দ্বিতীয়তঃ যখন কোনো অতি ভারী নক্ষত্র তার নিউক্লিও সংযোজন প্রক্রিয়ার অন্তিম লগ্নে এসে উপস্থিত হয়। নিউক্লিও সংযোজন কমে আসায় শক্তির বিকিরণও কমে আসে। একই সঙ্গে নক্ষত্রের বহিঃস্তরে তখন কমে আসতে থাকে বিকিরণ চাপের সাহায্য। অপরদিকে কেন্দ্রে উপস্থিত আয়রন, নিকেল বা কোবাল্টের মতো মৌলের উপস্থিতিতে তীব্র হয়ে ওঠে মহাকর্ষীয় বল। অভাবনীয় দ্রুত গতিতে সংকুচিত হতে থাকে সমগ্র নক্ষত্রের শরীর। মহাজাগতিক বিস্ফোরণে উড়ে যায় নক্ষত্রের উপরের স্তর। ফলে উৎপন্ন হয় শকওয়েভ (shockwave)। অকল্পনীয় চাপ, ঘনত্ব ও শকওয়েভের উপস্থিতিতে নতুন করে ঘটতে শুরু করে বিচিত্র রকম নিউক্লিও সংযোজন প্রক্রিয়া। অনেক ক্ষেত্রেই এই সংকোচনের এর পরিণতি স্বরূপ নিউট্রন সমৃদ্ধ 'নিউট্রন-নক্ষত্র'-র জন্ম হয়। আরো ভারী নক্ষত্র কখনো বা অকল্পনীয় ঘনত্ব ও ভরের 'ব্ল্যাক হোল'[৩]-এ পরিণত হয়।

ইউলিয়া কাজানাস্কি অঙ্কিত সুপারনোভা বিস্ফোরণ

যেসব নক্ষত্রের প্রাথমিক ভর সূর্যের চেয়ে আট গুণের কম তাদের কেন্দ্র সংকুচিত হয়ে শ্বেতবামন নক্ষত্রে পরিণত হয়। কিন্তু আরো ভারী নক্ষত্ররা টাইপ-টু মহাজাগতিক বিস্ফোরণ ঘটায়। সুপারনোভা নিউক্লিও সংশ্লেষণের সময় নিউট্রন সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় (r-process) ভারী মৌলের নিউট্রন সমৃদ্ধ আইসোটোপ উৎপন্ন হয় যা বিটা-কণা (β particle) ত্যাগ করে উচ্চতর স্থায়ী মৌল তৈরি করে, যেগুলি পুনরায় তীব্র নিউট্রন ফ্লাস্ক (প্রায় $১০^{২২}$ নিউট্রন/বর্গসেমি/সেকেন্ড)-এর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে টিন, রূপো, সোনা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতির মতো ভারী মৌল ছাড়াও ধাপে ধাপে ল্যান্থানাইডস্ বা অ্যাক্টিনাইডস্-এর মতো আরো ভারী ও তেজস্ক্রিয় মৌলের পরিণত হতে পারে।

জানার অদম্য আগ্রহ ও বুদ্ধিমত্তায় একদা আমরা খুঁজে বের করেছিলাম পদার্থের গঠন কৌশল—অণু, পরমাণু, রাসায়নিক বন্ধন প্রভৃতি। জীবদেহ ছাড়াও আমাদের চারপাশের চেনা-অচেনা জগতের প্রতিটি পদার্থই সৃষ্টি হয়েছে বিপুল সংখ্যক জটিল অণুর সমন্বয়ে। সেই অণুগুলি আবার কতগুলি নির্দিষ্ট পরমাণুর পারস্পরিক বন্ধনের ফলে সৃষ্ট। অন্যদিকে আমাদের দেহের সিংহভাগই তো হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি মৌল দিয়ে তৈরি। তাছাড়া আছে আয়রন, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, জিঙ্ক প্রভৃতি কিছু ধাতু, যারা বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে প্রতিটি মৌলিক পরমাণুর জন্ম আবার কোন সুদূর অতীতে কোনো এক নক্ষত্রের গর্ভে বা কোনো মহাজাগতিক বিস্ফোরণের পরিমণ্ডলে। অর্থাৎ কেবলমাত্র বেঁচে থাকাই নয়, মৃত্যুর পরও আমাদের দেহ থেকে প্রকৃতিতে মিশে যাওয়া প্রতিটি মৌলই বয়ে বেড়াবে পৃথিবী থেকে শত-সহস্র আলোকবর্ষ দূরে লক্ষ-কোটি বছর আগে কোনো এক নক্ষত্রলোকের নিউক্লিওসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার চিহ্ন। আক্ষরিক অর্থে তো আমরা সবাই তারার অংশ!

E.mail.acnbu13@gmail.com • M : 9434377067

পাদটীকা :

১. মোটামুটিভাবে মাঝারি ভরের নক্ষত্র যাদের জ্বালানী অনেকটাই ফুরিয়ে এসেছে এবং সূর্যের আয়তনের চেয়ে দশ থেকে হাজার গুণ বিশালাকার। এই নক্ষত্রদের উপরিতলের তাপমাত্রা মোটামুটি ৫০০০ কেলভিন বা তার চেয়ে কম হওয়ায় এরা সাধারণতঃ লালচে কমলা বর্ণের হয়। তাই এদের লালদৈত্য নক্ষত্র বলে।

২. সূর্যের ভরের ১.৪ গুণ এই ভর অঙ্ক কষে নির্ণয় করেছিলেন ভারতীয় পদার্থবিদ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর। গবেষণার সাফল্য হিসাবে তিনি ১৯৮৩ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

৩. ব্ল্যাকহোল আসলে অকল্পনীয় তীব্র মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র যুক্ত এমন অঞ্চল যার কবল থেকে কোনো পদার্থ এমনকি কোনো বিকিরণও মুক্তি পায় না।

মহিলা বিজ্ঞানী ১

মাদাম কুরী : অনন্য মহাজীবন

অনিন্দ্য দে

রাশিয়া অধিকৃত পোল্যান্ডে, ১৮৬৭ সালের ৭ নভেম্বর জন্ম মারিয়া স্ক্লোদোস্কার। বাবা-মা দুজনেই প্রতিথযশা শিক্ষক। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে স্ক্লোদোস্কি পরিবারে নেমে এসেছিল ঘোর দুর্বিপাক। ফলত ছোটবেলা থেকেই মারিয়া ও তার অন্য চার ভাইবোনকে দাঁড়াতে হয়েছিল তীব্র সংগ্রামের মুখোমুখি। ১৮৮৩ সালে সোনার পদক নিয়ে পাশ করা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার জন্য কোনও প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন না মারিয়া, কারণ তিনি মহিলা। বাধ্য হয়েই মারিয়া পাড়ি দিলেন ফ্রান্সে, ভর্তি হলেন পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুরু হল বিজ্ঞানের কেরিয়ার। কিন্তু সে রাস্তাটাও সহজ ছিল না। সারাদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার পর দু'পয়সা উপার্জন করার জন্য সন্ধেবেলায় তাকে বেরোতে হত প্রাইভেট টিউশন করাতে। অগত্যা ছোট্ট এক চিলেকোঠার ঘরে আধপেটা খেয়ে সারা রাত জেগে পড়াশোনা করতে হত তাকে। এই মারিয়াকেই আমরা পরবর্তীকালে চিনেছি সর্বজন শ্রদ্ধেয়া ম্যাডাম কুরী হিসেবে।

১৮৯৪ সালে পারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যার উচ্চতর ডিগ্রীলাভের পর মারিয়া শুরু করলেন স্টিলের বিভিন্ন চৌম্বক ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা। কিন্তু ছোট্ট গবেষণাগারে মোটেও সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না মারিয়া, সুযোগ খুঁজছিলেন বড় কোনও গবেষণাগারে কাজ করার। এসময়েই মারিয়ার সাথে যোগাযোগ হল ইকোলে ইনস্টিটিউটের রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক পিয়ের কুরীর। পিয়েরের গবেষণাগার খুব বড় মাপের না হলেও, তিনি মারিয়ার জন্য একটু জায়গা বের করতে পেরেছিলেন। তাসত্ত্বেও গ্রীষ্মের ছুটিতে মারিয়া ফিরে গেলেন পোল্যান্ডে। কিন্তু অবারও সেই একই বঞ্চনা, মহিলা বলে মাতৃভূমি পোল্যান্ডের ক্র্যাকাও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কাজের সুযোগ দিতে রাজি হল না। অভিমানী মারিয়া ফিরে এলেন ফ্রান্সে। বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেন পিয়েরের সাথে। শুরু হল নতুন জীবন।

১৮৯৪ সালে উইলহেল্ম রয়েন্টজেন আবিষ্কার করলেন এক অদ্ভুত আলো, যা আমাদের চেনাজানা অস্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে দিয়েও চলে যেতে পারে। নাম দিলেন এক্স-রশ্মি। কিছুদিন পর, ১৮৯৬ সালে হেনরি বেকারেল দেখলেন ইউরেনিয়াম লবন থেকেও এক্স-রশ্মির মতো বিকিরণ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তার জন্য বাইরে থেকে কোনও শক্তি প্রয়োগ করার দরকার নেই; ইউরেনিয়াম থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেই বিকিরণ বেরিয়ে আসছে। মারিয়া এই বিকিরনকেই তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিলেন।

বিভিন্ন পদার্থের নমুনা নিয়ে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করার এক অভিনব পদ্ধতি খুঁজে বের করলেন মারিয়া। বছর পনেরো আগে বস্তুর চার্জ মাপার জন্য এক নতুন ধরনের ইলেক্ট্রোমিটার তৈরি করেছিলেন পিয়ের আর তার ভাই। সেই যন্ত্রটি ব্যবহার করে মারিয়া দেখলেন এক টুকরো ইউরেনিয়াম তার আশেপাশের অঞ্চলের বায়ুকে তড়িৎ পরিবাহী করে তোলে। ইউরেনিয়ামের সক্রিয়তা যে শুধুমাত্র নমুনায় কতটা ইউরেনিয়াম উপস্থিত, তার উপরেই নির্ভর করে, সেটাও বোঝা গেল। মারিয়া অনুমান করতে শুরু করলেন, এই বিকিরণের উৎপত্তি একেবারে পরমানুর ভিতর থেকে। পরমানু যে অবিভাজ্য নয়, তার স্বপক্ষে এটা একটা মস্ত বড় পদক্ষেপ।

১৮৯৭ সালে বড় মেয়ে আইরিনের জন্মের পর মারিয়া পড়াতে শুরু করলেন ইকোলে নরম্যাল সুপিরিয়র ইন্সটিটিউশনে। সেখানকার রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা বিভাগের পাশের একটা পরিত্যক্ত ঘরে, আগে যেখানে মেডিকেল কলেজের শব ব্যবচ্ছেদ হত, গবেষণা শুরু করলেন ইউরেনিয়ামের দুটি আকরিক পিচব্লেন্ড আর চ্যালকোলাইট নিয়ে। দেখা গেল বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের চাইতে পিচব্লেন্ড চারগুণ বেশি সক্রিয়, আর চ্যালকোলাইট দ্বিগুণ বেশি সক্রিয়। সুতরাং ইউরেনিয়ামের চেয়েও সক্রিয় কোনও পদার্থ যে এই দুই আকরিকে আছে, সেটা নিশ্চিত। ১৮৯৮ সালে খোঁজ পাওয়া গেল অতি সক্রিয় থোরিয়ামের। মারিয়ার এই কাজে পিয়ের এতটাই উদ্বুদ্ধ হলেন যে, নিজের কেলাস সংক্রান্ত গবেষণার কাজ ছেড়ে দিয়ে যোগ দিলেন মারিয়ার সঙ্গে। অধ্যাপক লিপম্যানের উদ্যোগে তাড়াতাড়ি করে ১২ এপ্রিল ১৮৯৮ মারিয়া তার গবেষণার খবর সায়েন্স অ্যাকাডেমীর জার্নালে প্রকাশ করার জন্য পাঠালেন। কিন্তু দেখা গেল দু'মাস আগেই কার্ল স্মিট থোরিয়ামের বিকিরণ সংক্রান্ত খবর প্রকাশ করে ফেলেছেন। কিন্তু মারিয়ার গভীর প্রত্যয় ছিল যে, পিচব্লেন্ড আর চ্যালকোলাইটে থোরিয়ামের থেকেও

বেশি সক্রিয় কোনও পদার্থ আছে। জুলাই মাসে পিয়ের আর মারিয়া সত্যিই নতুন একটা মৌল খুঁজে পেলেন। মারিয়ার স্বদেশ মাতৃকার স্মরণে তার নাম রাখা হল পোলোনিয়াম। ঐ বছরের ২৬ ডিসেম্বর তারা দ্বিতীয় আরেকটা মৌলের কথা ঘোষণা করলেন। রশ্মি শব্দের ল্যাটিন প্রতিশব্দ থেকে তারা তার নাম রাখলেন 'রেডিয়াম'।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত বিশুদ্ধ পোলোনিয়াম বা বিশুদ্ধ রেডিয়াম কোনটাই বিজ্ঞানীদের হাতে ছিল না। তাই কুরীদম্পতি লেগে পড়লেন বিশুদ্ধ পোলোনিয়াম আর রেডিয়াম বের করে আনার সাধনায়। তবে কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। কারণ যে পিচব্লেন্ড নিয়ে তারা কাজ শুরু করেছিলেন সেটা বেশ জটিল একটা যৌগ। রাসায়নিকভাবে এর উপাদান মৌলগুলোকে আলাদা করা খুব কঠিন কাজ। তবে পিচব্লেন্ড থেকে পোলোনিয়াম আলাদা করা তুলনায় অনেক সহজ। কারণ রাসায়নিক দিক থেকে পোলোনিয়াম অনেকটাই বিসমাথের মতো। আর পিচব্লেন্ডে পোলোনিয়ামই একমাত্র বিসমাথের মতো পদার্থ। কিন্তু রেডিয়ামের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বেশ কঠিন। রাসায়নিক ধর্মের দিক থেকে রেডিয়াম অনেকটা বেরিয়ামের মতো। আর পিচব্লেন্ডে রেডিয়াম আর বেরিয়াম দুটোই থাকে। ১৯৮৯ সালে তারা পিচব্লেন্ডে রেডিয়ামের উপস্থিতি টের পেলেন। ১৯০২ সালে তারা এক টন পিচব্লেন্ড থেকে এক গ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ রেডিয়াম ক্লোরাইড সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে কখনও যৌথভাবে, কখনও মারিয়া একা ৩২টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পেপারে ঘোষণা করা হল, মানব শরীরে কোনও কোশে টিউমার জন্মালে, রেডিয়ামের সংস্পর্শে সেই সমস্ত কোশ, সুস্থ কোশের তুলনায় তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়।

১৯০৩ সালের জুন মাসে লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশন থেকে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হল তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। কিন্তু মহিলা বলে তাকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হল না। এর মধ্যেই রেডিয়ামকে ঘিরে ব্যবসার ঢেউ উঠেছে। কিন্তু কুরী দম্পতি তাদের এই আবিষ্কার পেটেন্ট করাননি। ফলে এই লাভজনক ব্যবসা থেকে খুব বেশি কিছু অর্থ তারা পাননি। অবশেষে ১৯০৩ সালে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সেস বিকিরণসংক্রান্ত গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য পিয়ের, মারিয়া ও বেকারেলকে পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার দিলেন। প্রথম মহিলা হিসেবে নোবেল পেলেন মারিয়া সালোমেয়া স্ক্লোদোস্কা ওরফে মেরী কুরী। কিন্তু সেখানেও যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা ছিল। নোবেল কমিটি শুরুতে পিয়ের আর বেকারেলকে পুরস্কৃত করার কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু মহিলা বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষক সুইডিশ গণিতজ্ঞ ম্যাগনস গোয়েস্তা মিতাগ-লেফলার মারিয়ার হয়ে জোরালো সওয়াল করায় কমিটি শেষ পর্যন্ত মারিয়ার নাম যোগ করতে বাধ্য হন।

কিন্তু মারিয়ার জীবনে আবার নেমে এল দুর্বিপাক। ১৯০৬ সালের ১৯ এপ্রিল। বৃষ্টির দিনে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ঘোড়ায় টানা গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল পিয়েরের। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পিয়েরের স্মৃতিতে এক বিশ্বমানের গবেষণাগার তৈরির সংকল্প নিয়ে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দিলেন মারিয়া। পারী বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রথম একজন মহিলা অধ্যাপক পেল।

কিন্তু নতুন গবেষণাগার তৈরির জন্য মারিয়াকে কম লড়াই করতে হয়নি। পারী বিশ্ববিদ্যালয় মারিয়াকে নতুন গবেষণাগার তৈরির সুযোগ করে দিচ্ছে না বলে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর পল রক্স বেজায় চটে গিয়ে মারিয়াকে পাস্তুর ইনস্টিটিউটে যোগ দিতে বলেন। মারিয়াও পারী বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেন। তখন ১৯০৯ সালে পারী বিশ্ববিদ্যালয় ও পাস্তুরের ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে মারিয়ার জন্য তৈরি হয় তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কিত গবেষণার নতুন ল্যাবরেটরি রেডিয়ম ইনস্টিটিউট, বর্তমানে এর নাম কুরী ইনস্টিটিউট।

বিশুদ্ধ পোলোনিয়াম আলাদা করতে না পারলেও এই রেডিয়াম ইনস্টিটিউটে কাজ করেই ১৯১০ সালে মারিয়া বিশুদ্ধ রেডিয়াম আলাদা করতে সমর্থ হন। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের একটা আন্তর্জাতিক

কুরি ইনস্টিটিউট

মাপকও তিনি স্থির করে দেন। পিয়ের ও মারিয়ার সম্মানে এর নাম রাখা হয়েছে কুরি। ১৯১১ সালে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সেস দ্বিতীয় বারের জন্য রসায়নের নোবেল প্রাপক হিসেবে মারিয়াকে বেছে নিলেন। দুবার নোবেল পাওয়ার কৃতিত্বও তারই প্রথম।

১৯১৪ সালে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। মারিয়া তার চলমান রেডিওগ্রাফি ইউনিট নিয়ে চলে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। শুরু করলেন আহত সৈনিকদের চিকিৎসা। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন লক্ষাধিক সেনার চিকিৎসা করেছিল তাঁর এই ইউনিট। এই অভিজ্ঞতার কথা ধরা আছে তাঁর Radiology in War বইতে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে 'তেজস্ক্রিয়তা' নামে একটি বইও তিনি লিখেছিলেন। বইটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। ১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই এই মহান জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কন্যা ইরিনি কুরীর সাথে মেরী কুরী। ইরিনিও নোবেল পেয়েছেন।

E.mail.anindya05@gmail.com • M : 9432220412

সাধারণের স্বাস্থ্য : কয়েকটি পরামর্শ

ডাঃ গৌরব রায়

[আগের সংখ্যায় যা ছিল : রোগব্যাধিমুক্ত শরীর স্বাস্থ্য রাখতে কী করতে হবে— বিশ্রাম ও ঘুম কখন কতটা— খাওয়া দাওয়া কখন কী কী এবং কতটা পরিমাণ।]

এক এক বয়স, লিঙ্গ ও জীবিকার জন্য এক এক প্রকার খাদ্য, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে খাদ্যপ্রাণ ও এনার্জি (কিলো ক্যালরিতে মাপা হয়) লাগবে। যেরকম শিশু, বাড়ন্ত বাচ্চা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, প্রসূতি, কায়িকশ্রমিক, খেলোয়াড় প্রভৃতিদের বেশি ক্যালোরি প্রয়োজন।

শিশু, বাড়ন্ত বাচ্চা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের বেশি করে প্রোটিন প্রয়োজন। প্রোটিনের কাজ শরীর গঠন; শরীরের কোষের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; অ্যান্টিবডি, প্লাজমা, হিমোগ্লোবিন, এনজাইম, হরমোন প্রভৃতি তৈরি করা। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুধজাত দ্রব্য, ডাল, আটা, বীনস, বাদাম প্রভৃতি প্রোটিনের উৎস। প্রাণীজ বা আমিষ প্রোটিনের মান নিরামিষ প্রোটিনের চাইতে উন্নত।

ফ্যাটসের মধ্যে পলি-আনস্ট্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস (পি.ইউ.এফ.এ.) অর্থাৎ লিনোলিক অ্যাসিড, অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সূর্যমুখী, সানফ্লাওয়ার, কর্ণ, সোয়াবিন, সিসেম, বাদাম, সর্ষে, পাম প্রভৃতি তেল, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতির মধ্যে এগুলি পাওয়া যায়। মাছের মধ্যে পাওয়া যায় ওমেগা ও ফ্যাটি অ্যাসিড প্রভৃতি উপকারী ফ্যাটি অ্যাসিড।

কার্বোহাইড্রেট হল মূল এনার্জির উৎস। আটা, চাল, আলু, সুজি, কন্দ, মূল, ফল প্রভৃতি থেকে এগুলি আহরিত হয়।

ডায়েটারি ফাইবার বা রাফেজ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যবস্তু। এগুলি পরিপাকতন্ত্র সুস্থ-সবল রাখতে, খারাপ খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে দিতে এবং পর্যাপ্ত মলত্যাগের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু ও হজম পরবর্তী বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে বের করে দিতে সাহায্য করে। বিভিন্ন শাকসবজী, ডাটা, ফল, আটা প্রভৃতিতে এগুলি থাকে।

শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভিটামিন 'এ' থাকে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এবং সবুজ ও হলুদ ফল ও শাকসব্জীতে।

ভিটামিন 'ডি' উৎপন্ন হয় সূর্যালোক থেকে এবং পাওয়া যায় মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ থেকে। 'বি' ভিটামিনস, ফোলেট পাওয়া যায় মাছ, মাংস, ভাত, শাক-সবজী ও ফল থেকে বিশেষ করে সবুজ পাতাওয়ালা শাকসবজি থেকে। ভিটামিন 'সি' বেশি থাকে আমলকি, পেয়ারা, বিভিন্ন ধরনের লেবু, অঙ্কুরোদ্গম ছোলা, সবুজ পাতাওয়ালা শাকসব্জী, ফলে।

মিনারেলের মধ্যে ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁত গঠন এবং অন্যান্য শারীরিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয়। বাড়ন্ত বাচ্চা, কিশোর-কিশোরীদের এবং ঋতুপরবর্তী বয়স্ক মহিলাদের প্রয়োজন হয়। দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, আতা, আখের গুড় প্রভৃতিতে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে। ফসফরাস থাকে মাছে, বিশেষত ছোট মাছে, এছাড়াও আটা, সব্জীতে। সোডিয়াম ও পটাশিয়াম লবণ, ডাবের জল, লেবু প্রভৃতিতে এবং ম্যাগনেশিয়াম থাকে গম, জোয়ার, বাজরা, রাগি, আটায় এবং ছোলা, ডাল, সব্জীতে।

অতি প্রয়োজনীয় আয়রণ বেশি থাকে মাংস, মাছ, ডিমে। এছাড়াও ডুমুর, কাঁচকলা, আটা, সবুজ পাতাওয়ালা সব্জী, ডাল, বাদাম, তৈলবীজ, আখের গুড়, শুকনো ফল প্রভৃতিতে। ঋতুবতী নারী (১০-১৫ বছর থেকে ৪০-৫০ বছর বয়স অবধি) এবং গর্ভবতী নারীর অতিরিক্ত আয়রণ প্রয়োজন। গর্ভবতীর, এর সঙ্গে প্রয়োজন অতিরিক্ত ফোলেট বা ফোলিক অ্যাসিড। আয়োডিন আসছে লবণ, মাছ, আটা, মাংস, দুধ প্রভৃতি থেকে। আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যা হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত ফ্লোরিনে ফ্লুরোসিস আর কম ফ্লোরিনে দাঁতের ক্ষয় হয়। মাত্রাযুক্ত ফ্লোরিন পাই পানীয় জল, মাছ, দুধ, চা থেকে। এছাড়া জিঙ্ক, কপার, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম, সেলেনিয়াম, মলিবডেনাম প্রমুখ ট্রেস এলিমেন্টস অল্প পরিমানে প্রয়োজন হয় এবং আমরা তা পাই সুষম আহারের আটা, মাছ, মাংস, ডিম, সব্জী, ফল প্রভৃতি থেকে। অ্যান্টি অক্সিডেন্টেসেরও দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং তা পাওয়া যায় তাজা আটা, ফল, সব্জী, ডাল, মশলা, চা প্রভৃতি থেকে। খাদ্যের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক / জৈব, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকহীন সতেজ খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনে নিজেরাই একফালি জমিতে, বাগানে, ছাঁদে, টবে চাষ করে নিতে হবে।

নেশা

যে কোন নেশাই ক্ষতিকর। তাই বর্জনীয়। সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, পাইপ, খইনি, গুড়াকু, হুকো, গুটখা ইত্যাদি তামাক জাতীয় পদার্থ খাওয়া চলবে না। মদ্যপান নিষেধ। ড্রাগস বিষ। কোল্ড ড্রিঙ্ককসও পরিত্যজ্য। এতে না আছে কোন পুষ্টি অথচ আছে একগাদা ক্যালোরি ও চিনি। নেশার কারণে অসুস্থতা, পঙ্গুত্ব, পারিবারিক অশান্তি, কর্মচ্যুতি, অবসাদ, আত্মহত্যা, মৃত্যু, সামাজিক হিংসা, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি ঘটে।

পরিচ্ছন্নতা

সুস্থ ভাবে বাঁচতে হলে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমে মনের, তারপর শরীরের। নিজের পাড়া, এলাকা ও অঞ্চল, তারপর রাস্তাঘাট স্টেশন বাজার, অফিস স্কুল সব পরিচ্ছন্ন ও টিপটিপ রাখতে হবে। যত্রতত্র থুথু, কফ, পান-গুটখা-পানমশালার পিক, ময়লা ফেলা, মলমূত্র ত্যাগ, শিশু ও পোষ্যদের মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি বন্ধ করতে হবে। প্রতিদিন সকালে মলত্যাগ ও ভাল করে স্নান করতে হবে। গরমকালে সন্ধ্যায় স্নান করতে হবে। প্রতিটি বাড়িতে বিজ্ঞানসম্মত মলমূত্র ত্যাগের ও স্নানের বর্জ্য সংস্থাপনের ব্যবস্থাপনা করে তুলতে হবে। নিয়মিত চুল, দাড়ি, নখ কাটতে / ছোট করতে হবে। শরীরের ত্বককে পরিষ্কার ও শুকনো রাখতে হবে। যৌনাঙ্গকে পরিষ্কার রাখতে হবে। পরিষ্কার ও শুকনো পোশাক ও অন্তর্বাস পড়তে হবে। আমাদের আবহাওয়ার কারণে সুতির ঢিলেঢালা পোশাক পড়া উচিত। বাইরে বেরোলে চটি বা হাওয়াইয়ের বদলে ঢাকা চামড়া বা কাপড়ের জুতো অথবা স্নিকার পরতে হবে। জনসমক্ষে কাশি বা হাই বা ঢেকুর তোলার সময় হাত বা রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকতে হবে। থাকার জায়গা, স্কুল-কলেজ ও কর্মক্ষেত্রের ঘর খোলামেলা অর্থাৎ রোদ-হাওয়া যুক্ত হলে ভাল। স্কুল, অফিস, বাজার, স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, ফেরিঘাট প্রভৃতিতে পরিচ্ছন্ন ও সুলভ শৌচালয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পশু-পাখি পালনের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তাদের পুষতে হবে। তাদের পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে,

তাদের নিয়মিত টীকা ও চেক আপ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাতে হবে।

বাইরে থেকে এসে জুতো, পোশাক পাল্টানো এবং ভাল করে হাত-মুখ-চোখ-নাক ধোয়া উচিত। খাবার আগে, খাবার পরিবেশনের আগে ও মলত্যাগের পর ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। বেশি ক্ষারযুক্ত সাবান পরিত্যজ্য। রোজ রাতে খাবার পর ভাল করে দাঁত মাজা এবং মাঝে মাঝে ফ্লস ব্যবহার করা উচিত। নিয়মিত কাপড়চোপড় ভালভাবে কেচে ইস্ত্রি করে পরা উচিত। চুল ছোট রাখা উচিত এবং সপ্তাহে একদিন শ্যাম্পু করা উচিত। বাড়িতে জল জমতে দেওয়া উচিত নয়। ফ্রিজ, টব, এসি, কুলার, অ্যাকোরিয়াম প্রভৃতি থেকে সপ্তাহে একদিন জল ফেলা বা পাল্টানো উচিত। জল ধরে রাখতে হলে ঢেকে রাখতে হবে। স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিনের ভেন্ডিং মেশিন বসাতে হবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

সকলেরই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত। গর্ভবতী মা ও শিশুদের নির্ধারিত সময়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টীকা নেওয়া উচিত। কম বয়সীদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় শরীরের পুষ্টি ও বিকাশ, শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা, চোখ-কান-দাঁত প্রভৃতির সুস্থতার উপর জোর দেওয়া উচিত। বয়স্কদের ক্ষেত্রে, মোটামুটি ৪০ বছরের পর, প্রতি বছর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত। সেখানে বিপি; রক্তের সুগার, ক্রিয়াটিনিন, কোলেস্টেরল, ইউরিক অ্যাসিড; ইসিজি প্রভৃতি প্যারামিটার এবং হার্ট, লাংস, লিভার, কিডনি প্রভৃতি ওরগ্যানের ফাংশান দেখা উচিত। নারীর ক্ষেত্রে স্তন ও জরায়ু মুখ ক্যান্সার এবং পুরুষের ক্ষেত্রে লাংস ও প্রসট্রেট ক্যানসার এবং উভয়ের ক্ষেত্রে ডিমেনসিয়া, অস্টিওপোরোসিস, স্পনডাইলোসিস, অস্টিওআরথাইটিস, গ্লুকোমা, ক্যাটারাক্ট, ইসকিমিয়া প্রভৃতির উপর নজর রাখা উচিত। হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, হাইপোথাইরয়েড ইত্যাদি থাকলে ঠিকমতো চিকিৎসা এবং নিয়মিত চেপআপ করা উচিত। সাধারণভাবে ছোটবেলা থেকেই অতিরিক্ত লবণ, চিনি, মশলা, তেল, ঝাল ইত্যাদি না খাওয়া উচিত। বিভিন্ন শারীরিক প্রতিবন্ধিকতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট চিকিৎসা, ব্যায়াম ইত্যাদি করা ও নির্দিষ্ট যত্ন নেওয়া উচিত। বয়স ও উচ্চতার সাপেক্ষে ওজন, বি.এম.আই প্রভৃতি পরিমাপ করে নিজেরাই সচেতন হওয়া যায়। বাঙালি ও ভারতীয়দের কিছু বিশেষ সমস্যা আন্ত্রিক; কৃমি ও প্রোটোজোয়ার সংক্রমণ; পতঙ্গজনিত রোগ যেমন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, কালাজ্বর, জাপানী এনকেফেলাইটিস, অন্যান্য হেমারেজিক ফিভার, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ; হাঁপানী ও অন্যান্য এলার্জি; ডায়াবেটিস; প্রেসার ও স্ট্রোক; নিউমোনিয়া; সিওপিডি; সাপ ও কুকুরে কামড়; ভুড়ি ও হাটুব্যথা এবং স্পন্ডিলাইটিস, মানসিক অবসাদ, চর্মরোগ প্রভৃতি নিয়ে বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত।

ব্যায়াম, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা

ছোটবেলা থেকেই ব্যায়াম, শরীরচর্চা, খেলাধুলা করে শরীর ও স্বাস্থ্যকে তৈরি করতে হবে; শক্তপোক্ত, শক্তিশালী ও সহিষ্ণু হতে হবে। বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের ফুটবল, বাস্কেটবল, ভলিবল, অ্যাথলেটিকস্, জিমন্যাসটিকস্, সাঁতার, যোগাসন, জুজুৎসুসহ মার্শাল আর্টস, ব্যাডমিন্টন, লন টেনিস, টেবল টেনিস, কবাডি, কুস্তি, বক্সিং, খোখো, হ্যান্ডবল প্রভৃতি, যার যেটা বা যেগুলি ভাল লাগে, চুটিয়ে করতে বা খেলতে হবে। এইভাবেই শরীর, স্বাস্থ্য গড়ে উঠবে। জল, কাদা, বৃষ্টি, রোদ সবকিছু সহনশীল হতে হবে। বয়ঃসন্ধির সময় থেকে বিশেষজ্ঞের পরামর্শে উন্নত পুষ্টিকর খাদ্য ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন মাংসাপেশী শক্তিশালী করে তোলার ব্যায়াম শুরু করতে হবে। ফুটবল ও কবাডি আমাদের রাজ্যের সাপেক্ষে দুটি অসাধারণ উপযোগী খেলা এবং দৌড় ও সাঁতার দুটি অসাধারণ উপযোগী ব্যায়াম। ৬০ বছরের বেশি বয়সীরা হালকা ব্যায়াম, দৌড়ের পরিবর্তে জোরে হাঁটা বা জগিং, সাঁতার ও যোগাসন করতে পারেন। পাড়া, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেলে মণিমেলা, ব্রতচারী, স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, এন.সি.সি., টেরিটোরিয়াল আর্মি প্রভৃতির প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত।

যৌনতা

যৌনতা একটি স্বাভাবিক জৈবনিক ইচ্ছা ও প্রক্রিয়া। দুটি সুস্থ স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্ক মানব মানবীর পারস্পরিক ইচ্ছা ও সম্মতিতে হওয়া এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুস্থ বিষয়। পশুপাখী জীব জগতে বিষয়টি সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে হয়। কিন্তু মানব সমাজে ধর্মীয়, সামন্ত, গোষ্ঠী, কৌম, সামাজিক, অর্থনৈতিক, লিঙ্গানুপাত, পারিবারিক প্রভৃতি কারণে অত্যন্ত বিধিনিষেধ, আর তাই বেশি বেশি যৌন অপরাধ ও বিকৃতি।

স্কুল স্তর থেকে রোগ প্রতিরোধ ও অপ্রাপ্ত বয়সে সন্তান ধারন রোধের লক্ষ্যে এবং বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের জীবনচক্র সম্পর্কে সচেতন করতে ও সঠিক বৈজ্ঞানিক দিশা দেখাতে যৌন শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

মানসিক স্বাস্থ্য

মানসিকভাবে অত্যন্ত দৃঢ়, স্থিরসঙ্কল্প, শক্তিশালী, প্রত্যয়ী, ধৈর্য্যশীল, তিতিক্ষু, শান্ত, লড়াকু, প্রফুল্ল, অধ্যবসায়ী, ধারাবাহিক ও স্থিতধী হতে হবে। এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। পারিবারিক সংস্কৃতি ও শিক্ষা, আত্মঅনুসন্ধান ও অনুশীলন, অধ্যয়ন ও প্রয়োগ, পরিবেশ ও তালিম এগুলির মাধ্যমে পরিশ্রম করে অর্জন করতে হবে। সঠিক খাদ্য, বিশ্রাম, পরিশ্রম, অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং ধ্যানের মাধ্যমে এগুলি রপ্ত করতে হবে। মানসিক সমস্যা হলে উপযুক্ত সাইকোলজিস্ট নতুবা তার পরামর্শে সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখাতে হবে। বেশি কাজের বোঝা থাকলে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে জঙ্গল, পাহাড়, নদী বা সমুদ্রতীরে ঘুরে আসতে হবে।

বিনয়ী ও অমায়িক হতে হবে। বেশি শুনতে ও কম বলতে হবে। আগে শুনতে ও পরে বলতে হবে। প্রত্যেককে উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কম সমালোচনা করতে হবে, বেশি কাজ করতে হবে। হাসিখুশী, সৎ ও পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। নিঃশব্দে আন্তরিকভাবে দ্রুতগতিতে কাজ করে যেতে হবে। লেখার মানসিকতা রাখতে হবে, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি-বুদ্ধি-বিশ্লেষণ প্রয়োগ করতে হবে। জয়লাভের জন্য সমস্ত বাধা উত্তীর্ণ হতে হবে।

‘লড়াই, করো লড়াই, করো লড়াই,
যতদিন না বিজয়ী হও—
যদি হারো একবার, লড়ো বারবার, লড়ো বারবার,
যতদিন না বিজয়ী হও—’

E.mail.gaurab18@gmail.com • M : 9153320581

গ্রহণ ও কুসংস্কার

লেখা : দেবাশীষ দাস ❑ ছবি : ঋতুপর্ণ মজুমদার

৩১শে জানুয়ারী ২০১৮ রাত্রির আকাশে ঘটে গেল এক বিরল মহাজাগতিক ঘটনা। আমরা পৃথিবী থেকে চাক্ষুস করলাম পূর্ণ-চন্দ্রগ্রহণ, ব্লু-মুন, সুপার মুন। ১৫০ বছর পর চাঁদের এই তিনটি অবস্থা একই সঙ্গে দেখা গেল। সমগ্র আমেরিকা, উত্তর-পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে এই চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেল। গ্রহণটি স্থায়ী ছিল ৫ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ও চাঁদটি সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে ছিল ১ ঘণ্টা ১৬ মিনিট।

এবারে আসি গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়। যখন সূর্য পৃথিবী ও চাঁদ এক সরলরেখায় অবস্থান করে এবং পৃথিবী সূর্যের থেকে আগত আলোকরশ্মিকে চাঁদে যাওয়া থেকে আটকে দেয় ফলে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর গিয়ে পরে, তখন ঘঠে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। তাছাড়া চাঁদের আরও দুটি অবস্থা ব্লুমুন ও সুপার মুন ছিল ঐদিন। একই মাসে দুইটি পূর্ণিমা হলে, মাসের শেষ পূর্ণিমাটিকে বলা হয় ব্লুমুন। জানুয়ারি মাসে এমন দুইটি পূর্ণিমা ছিল। প্রথমটি ১লা জানুয়ারি দ্বিতীয়টি ৩১শে জানুয়ারি। ওইদিন চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে চলে এসেছিল। রাতের আকাশে চাঁদকে অনেক বড় ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। চাঁদের এমন অবস্থাকে সুপার মুন বলা হয়। পৃথিবীর ছায়ায় ঢাকা পরে চাঁদ সম্পূর্ণ অন্ধকারে চলে গেলেও, চাঁদকে আকাশে লাল রঙের দেখায়। কারণ, সূর্যের থেকে আগত আলো পৃথিবীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেও, কিছু আলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দ্বারা প্রতিসৃত হয়ে চাঁদে গিয়ে পরে। সেই প্রতিসৃত আলোর লালবর্ণ বাদে বাকী বর্ণগুলি বায়ুমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হয়ে যায় লাল বর্ণ কম বিচ্ছুরিত হয়ে চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছায়, ঠিক যে কারণে সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় সূর্যকে লাল দেখায়। সেই বিচ্ছুরিত আলো পুনরায় চাঁদ থেকে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে পৌঁছয় ও চাঁদকে লাল রঙের দেখায়। এমন লাল রঙের চাঁদকে কখনও কখনও ব্লাড মুন বলা হয়। খালি চোখে এই গ্রহণ দেখা যায়, তাছাড়া দূরবীণ ও টেলিস্কোপের সাহায্যেও দেখা যেতে পারে। জীব জগতে এর কোন ক্ষতিকারক প্রভাব নেই।

এবার আসি অন্য কথায়। গ্রহণকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে আজও আছে নানান ধরনের কুসংস্কার যা বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর যুগে লজ্জাজনক। ধর্মীয় ব্যাখ্যা অনুসারে রাহু ও কেতু দুই অসুর সূর্য ও চন্দ্রকে গিলে নিলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে। ধর্মীয় সংস্কার অনুসারে গ্রহণের সময় জল, খাবার খাওয়া যায় না। জ্যোতিষ শাস্ত্রে রাহু ও কেতু নবগ্রহের মধ্যে স্থান পেয়েছে। রয়েছে রাহুদশা, কেতু দশা। এই দশা কাটাতে গেলে ধারণ করতে হবে অমুক রত্ন তমুক পাথর। এমন ধারণায় বিশ্বাস রাখেন এমন ব্যক্তিবর্গের কাছে আমাদের আবেদন এমন বিজ্ঞান বিরোধী চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসুন। জ্যোতিষ কোনো বিজ্ঞান নয়। এর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। সমাজে আর পাঁচটা কুসংস্কারের মতো জ্যোতিষ শাস্ত্রও একটি কুসংস্কার। রাহু ও কেতু কোনো গ্রহ নয়, পৌরাণিক চরিত্রমাত্র। এমন পৌরাণিক কল্পকাহিনির সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের কোনো সম্পর্ক নেই। চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি, নক্ষত্র— এগুলি মহাশূন্যে ভাসমান এক একটি গোলক। আমাদের ভালো থাকা, পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়া, বেকারত্ব, পারিবারিক সমস্যা, জন্ম ও মৃত্যুর সঙ্গে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। নিজের সময় ও অর্থ অপচয় বন্ধ করুন। সমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিশীল করে তুলতে সচেষ্ট হন।

E.mail.deba.tomra@gmail.com ● M : 9903594086

জানো কি?

বিজয় সরকার

❑ জ্বর হলে শীত করে কেন?

আমাদের শরীরের একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আছে। পরিবেশের তাপমাত্রা যখন শরীরের তাপমাত্রা থেকে কমে যায়, তখন আমাদের শীত করে। শীতকালে তাই আমাদের শীতবোধ হয়। যখন জ্বর হয়, শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। অর্থাৎ পরিবেশের তাপমাত্রা দেহের তাপমাত্রার চেয়ে কম। তাই আমাদের শীত করে।

❑ আমরা হাই তুলি কেন?

ক্লান্তিতে বা একঘেয়ে কাজ করতে করতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা মিনিটে ১৮ বার প্রশ্বাস নিই আর নিশ্বাস ছাড়ি। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে এলে শরীরে থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে আসার পরিমাণ কমে যায়। অর্থাৎ রক্তে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়, ফলে ফুসফুসে কম পরিমাণ অক্সিজেন প্রবেশ করে। হাই তুলে আমরা বেশি অক্সিজেন টানি, ছাড়িও বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড। হাই উঠলে নাক ছাড়াও মুখ দিয়ে প্রচুর অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করে। এই ভাবে স্বাভাবিক অবস্থাটা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়।

❑ সাধারণ জলকে কীভাবে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করা যাবে— বরফকে জলের ওপর ভাসতে দিয়ে, না বরফকে জলের তলায় কোন ভাবে ডুবিয়ে রেখে?

ঠান্ডা জলের ঘনত্ব সাধারণ জলের তুলনায় বেশি। জলের ওপর বরফের টুকরো ভাসিয়ে দিলে তা আশেপাশের জলকে ঠান্ডা করবে। ফলে ঠান্ডা জলের ঘনত্ব বেড়ে যাবে। সেই জল ভারি হয়ে নীচে নামবে। আর অপেক্ষাকৃত গরম জল তলা থেকে ওপরে উঠে আসবে। এই প্রক্রিয়া কিছুক্ষণ চলতে থাকলে পাত্রের সমস্ত জল ঠান্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বরফকে কোনভাবে জলে নীচে ডুবিয়ে রেখে ঠান্ডা করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে শুধুমাত্র নীচের জল ঠান্ডা হবে, কারণ নীচের জলের ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে তা ভারি হয়ে নীচেই পড়ে থাকবে। ওপর জল ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ পাবে না।

❑ আমাদের সাঁতার শিখতে হয়, কিন্তু জন্তু-জানোয়ারেরা তো জলে এমনিই ভাসে। কেন?

কোন কিছু ডোবে বা ভাসে কেন? যদি কোন জিনিসের ওজন সমান আয়তন জলের ওজনের চেয়ে কম হয়, তাহলে সেই জিনিসটা জলে ভাসে। আর যদি উল্টোটা হয় তাহলে সেই জিনিস ডুবে যাবে। মানুষের মাথা বাদ দিয়ে শুধু দেহের সমান আয়তনের জল নিয়ে যদি ওজন করা যায়, তাহলে দেহের চেয়ে জলের ওজন বেশি হবে। কিন্তু কেবল মাথার ওজনের বেলায় উল্টোটা হয়। তাই দেহটা যেখানে ভাসতে থাকে, মাথা সেখানে ডুবে যায়। আমরা যে সাঁতার শিখি, তা মাথাটাকে ভাসিয়ে রাখার জন্য। অন্যদিকে জন্তু জানোয়ারদের মাথার ওজন সমান আয়তন জলের ওজন থেকে হালকা। তাই তারা এমনিই জলে ভাসে, আলাদা ভাবে সাঁতার শিখতে হয় না।

E.mail.bijoysarkar4786@gmail.com ● M : 9432335882

সংবাদ

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ১৫তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

১৪ জানুয়ারি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের (কলকাতা) সভাঘরে বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ১৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক বিজ্ঞান লেখক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। শুরুতে সভাপতি ড. গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সম্মেলনে সুমিত্রা চৌধুরী বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞান ভাবনা ও বিজ্ঞান লিখন শৈলি নিয়ে আলোকপাত করেন। সম্পাদক তাপস মজুমদার উপস্থিত সকল বিদগ্ধ লেখক ও গুণীজনকে পত্রিকার পক্ষ থেকে স্বাগত জানান।

সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন এবং মোট ২০ জন বিজ্ঞান লেখক এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী

১ জানুয়ারি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যালয় থেকে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ১২৫তম জন্মদিনে এক বর্ণাঢ্য মিছিল এপিসি রোড— রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ — মানিকতলা বিবেকানন্দ রোড—হেদুয়া হয়ে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাসভবন পর্যন্ত পরিক্রমা করে। বিভিন্ন স্কুল, প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান সংস্থা (কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার ও চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা) অংশগ্রহণ করে।

পক্ষী নিরীক্ষণ শিবির

জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাবের ভোটপট্টি শাখার ব্যবস্থাপনায় ১১ এবং ১২ ফেব্রুয়ারী হেলাপাকড়ী জলপাইগুড়িতে ৪র্থ পক্ষী নিরীক্ষণ শিবিরে ৪৫জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। পাখি চেনা, পাখি সংরক্ষণ ও ডিমসহ বাসা সংরক্ষণ নিয়ে তথ্য আদানপ্রদান ও অনুশীলন করা হয়। দু'দিনের এই শিবির পরিচালনা করেন ডাঃ গৌতম ঘোষ, রাজা রাউত, তুলসী ধর ও জ্যোতির্ময় রায় ডাকুয়া প্রমুখ।

বিজ্ঞান দিবস

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল আয়োজিত জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে যাদবপুর বিদ্যালয়ের কেপি বসু হলে ২৭ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান দরবারের কর্মী অনুপ হালদারকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। শ্রী হালদার যমুনা, চুর্ণি, মাথাভাঙ্গা নদী ও জলাশয় রক্ষার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রয়াস চালাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে চুর্ণি ও মাথাভাঙ্গা নদীর দূষণ নিয়ে আলোকচিত্র সহযোগে শ্রী হালদার বক্তব্য রাখেন।

পরিবেশ ও ভ্রমণ নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনী

৪ ফেব্রুয়ারী হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপিঠ স্কুলে বেরিয়ে পড়ির ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ও ভ্রমণ নিয়ে সারাদিন ব্যাপী ১০টি বিষয় নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কর্ণধার প্রবীরচন্দ্র বসু 'বেরিয়ে পড়ি'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির

২৮ জানুয়ারি, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মন্ডৌরি টিচিং ফার্ম, নদিয়া ক্যাম্পাসে বিজ্ঞান দরবারের পরিচালনায় ৫ম বার্ষিকী প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরে পলাশি এ.ডি.পি গার্লস হাই স্কুল ও ফতেপুর হাই স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণির মোট ২২ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে সুজয় বিশ্বাস ছাত্র-ছাত্রীদের জানান যে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে আজ আমরা গাছ-পালা, পোকা মাকড় ও পাখিদের চিনে নেবো। এই শিবিরের গাইড অনুপ হালদার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রথমেই পাখি পর্যবেক্ষণে পরিক্রমা করান। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী নোট বুকে পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি পাখির নাম, বিবরণ লেখেন। পর্যবেক্ষণে যে পাখিগুলি দেখা যায়— সাদা বুক মাছরাঙা (রাজ্য পাখি), ঘুঘু পাখি, পিলাই ঘুঘু, কলার ডাভ, ফিঙে পাখি, ছাতারে পাখি, দোয়েল, হারি চাচা, বাঁশপাতি, শামুক খোল, স্টারলিং, গোবক, শালিক, নীল কণ্ঠ, পাপিয়া, বাজপাখি, বসন্ত বৌরি, পান কৌরি, পিনিয়া, বেনে বৌ, স্পটেড আউল প্রভৃতি। গাছের মধ্যে আম, নারকেল, ইউক্যালিপটাস, লিচু, ঝাউ, শিমুলতুলো, কার্পাস লেবু প্রভৃতি চেনানো হয়। বিভিন্ন ধরনের ধান (যেমন কালো ধান, চিনি গুড়া প্রভৃতি) এবং পানের চাষ কীভাবে করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে সেই তথ্য জানানো হয়।

একটি গাছের জন্য

শ্যামলকান্তি মজুমদার

একটি গাছের জন্য ঘুড়ি ও লাটাই
পাখি-আঁখি-গান-অভ্যর্থনা
একটি গাছের জন্য বাতাসে আলপনা

প্রাণময় বৃন্দগান বৃক্ষরোপণের
ভবিষ্যৎ স্বপ্ন গাথা বব ডিলানের

একটি গাছের জন্য সুকল্পিত ভোর
ঝকঝকে দিগন্তের দিকে চোখ মেলা
শিশু-কিশোর-যুবকের মাঠে বনখেলা
জারুল-পারুল মেয়ে শ্বাসে অক্সিজেন
রূপকথা গল্পসল্প ছুটে যাওয়া ট্রেন

বাঁচালে গাছের প্রাণ পৃথিবী কী ভালো
অশ্বত্থ পাতায় দেখো স্নেহ চমকালো

আপনার এলাকায় এই প্রথম ম্যানুয়াল ও ডিজিট্যাল ড্রইং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
অভিজ্ঞ T.V. আর্টিস্ট ও কার্টুনিস্ট দ্বারা বিজ্ঞান সম্মতভাবে শিক্ষার সু-ব্যবস্থা

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে হাতে ধরে শেখানো হয়।
- যে কোন বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ
- বিভিন্ন মাধ্যমের অঙ্কন প্রশিক্ষণ
- স্কুল ভিত্তিক পাঠক্রম অনুযায়ী অঙ্কন প্রশিক্ষণ
- বার্ষিক পরীক্ষার সু-ব্যবস্থা

কম্পিউটার ড্রইং অ্যানিমেশন • ফটোগ্রাফি • ডিজিটাল আর্ট • ইনডোর ও আউটডোর ড্রয়িং
যোগাযোগ ঃ 8961401423/9830470334

শব্দের খোঁজে ৬ : পাহাড়

পলক বন্দ্যোপাধ্যায়

১		২		৩		৪		৫
				৬				
৭			৮			৯		
			১০	১১				
১২		১৩				১৪		
				১৫				১৬
১৭	১৮					১৯		
২০					২১			

পাশাপাশি :

১. পাঁচ অক্ষরের পর্বতমালার পাকিস্তানে অবস্থান, প্রথম দুইয়ে জেলখানা শেষ দুইয়ে রঘুপতি।
৬. ভারত-চীন সীমান্ত, সিকিম রাজ্যে অবস্থিত এই গিরিপথ।
৭. পর্বতের গা বেয়ে নিম্নদিকে ধীরে প্রবহমান তুষারস্রোত।
৯. কার্গিল যুদ্ধে এই শৃঙ্গ অনেক রক্তের বিনিময়ে জয় করা হয়েছিল।
১০. উত্তর আমেরিকার বিখ্যাত এক পর্বতমালা।
১২. ভারতবর্ষের উত্তরী-মধ্য ভাগে এই মালভূমির অবস্থান।
১৪. পাক-আফগান সীমান্তে অবস্থিত এই উপত্যকা, আলকায়দা সন্ত্রাসবাদীদের বিচরণ ক্ষেত্র।
১৫. হিমালয়ের এক পর্বতশৃঙ্গ, প্রথম অক্ষরে জননী, দুইয়ে-তিনে শ্রীলঙ্কার এক প্রাক্তন উইকেটরক্ষক ——— ভিথার্না।
১৭. ইন্দোনেশিয়ার এই গিরিশৃঙ্গ তিন অক্ষরে নাম, দুইয়ে-তিনে ইঙ্গে তালা, প্রথম দুইয়ে ইঙ্গে উল্টে ক্ষতি।
১৮. স্পেনের এই গিরিশৃঙ্গ, তিন অক্ষরে নাম, একে-তিনে খেলার আগে যা করতে হয়, দুইয়ে-তিনে ইঙ্গে দৌড়ানোর প্রতিযোগীতা।
২০. দক্ষিণ আমেরিকার এক বিখ্যাত পর্বতমালা।
২১. সিকিম প্রদেশে অবস্থিত এই হিমালয় গিরিশৃঙ্গ, চার অক্ষরে নাম, প্রথম দুইয়ে তাম্বুল, শেষ দুইয়ে পাখিরা এটা দেয়।

উপর-নীচ :

২. ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণায় এই প্রাচীন পর্বতশ্রেণির অবস্থান।
৩. হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেগিরি ——— লোয়া।
৪. মহাদেবের অধিষ্ঠান যে পর্বতে।
৫. ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত আগ্নেয় দ্বীপ।
৮. হিমালয় পর্বতে যে দেবতার অবস্থান বলে মানা হয়, মহাদেব।
১১. আফ্রিকা মহাদেশের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ।
১২. চিন দেশে অবস্থিত হিন্দু তীর্থক্ষেত্র, ——— সরোবর।
১৩. অসম প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত এই উপত্যকা যেখানে শিলচর শহর অবস্থিত।
১৪. পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে তস্কররা যা করে থাকে।
১৬. সুইৎজারল্যান্ডের এই পর্বতশৃঙ্গ চার অক্ষরের নাম, একে তিনে অট্টা ———, বা বাড়ি, দুইয়ে-তিনে সমান এর এক রূপ।
১৮. কানাডায় অবস্থিত এই পর্বতশৃঙ্গ তিন অক্ষরে নাম; প্রথম অক্ষর ইঙ্গে আইন, শেষ দুইয়ে ইঙ্গে পুত্র।

শব্দের খোঁজে ৫ : উদ্ভিদ

পলক বন্দ্যোপাধ্যায়

১ কা		২ ক	ম	৩ ল		৪ আ	ম	৫ ন
ঠ		দ		৬ কু	সু	ম		য়
৭ গো	ল	ম	৮ রি	চ			৯ ক	ণ
লা			ঠা		১০ আ	১১ ক	ন্দ	
১২ প	১৩ ট	ল				চু		১৪ শি
	মে		১৫ ত	১৬ র	কা	রি		উ
১৭ কা	টো	য়া		যা			১৮ প	লি
পা			১৯ চা	ল	২০ তা		ল্ল	
২১ স	ং	শ্লে	ষ		২২ ল	জ্জা	ব	তী

প্রিয় পাঠক

- পত্রিকার জন্য আপনিও লেখা পাঠাতে পারেন। বিজ্ঞান অনুসন্ধানী অপ্রকাশিত লেখা পাঠান। লেখা হবে ৬০০ অথবা ১১০০ শব্দের মধ্যে।
- পত্রিকার সমালোচনা, পরামর্শ, গুণমান বিষয়ে অপানার সুচিন্তিত মতামত সাদরে গ্রহণ করব।
- পত্রিকার গ্রাহক হোন। বছরে ছ'টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা চল্লিশ টাকা। ডাকযোগে আপনার বাড়িতে পত্রিকা পাঠিয়ে দেব আমরাই।

কার্টুন : সৌরভ মুখার্জী ● M : 8961401423

পত্রিকা যোগাযোগ

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9332283356 ● জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 ● প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 ● কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 ● তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 ● কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 ● গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 ● পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর M. 9331035550 ● শিয়ালদহ স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) ● স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন M. 9153320581

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সরদার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস, বিবর্তন ভট্টাচার্য
E-mail : bijnandarbar1980@gmail.com / ganabijnan@yahoo.co.in